পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জন্মের পর সব টিকা
সময়মতো নিলে,
মারণ রোগের হাত
থেকে মুক্তি মেলে।

I.C.D.S | unicef for every child

১ম সপ্তাহ

শিশুর টিকাকরণ–এর গুরুত্ব

বুঝিয়ে বলুন

- জন্মের পরে শিশুর রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কম থাকে, এজন্য তাকে টিকা দেওয়া প্রয়োজন।
- টিকাকরণ শিশুকে যক্ষ্মা, পোলিও, হেপাটাইটিস–বি, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হিমোফাইলস বি জনিত নিউমোনিয়া ও ম্যানেনজাইটিস, হাম, রুবেলা, জাপানি এনকেফেলাইটিস ইত্যাদি মারণ রোগের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।
- টিকাকরণ শিশুমৃত্যুর হার কমাতে সাহায্য করে।
- টিকাকরণ শিশুর রোগ ভোগের হার কমায়।
- টিকাকরণ শিশুর অপুষ্টি রোধ করতে সাহায্য করে।

পরে প্রশ্ন করুন

১) টিকা নেওয়া শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় কেন?

২) টিকা নিলে কী কী মারণ রোগের হাত থেকে শিশুকে বাঁচানো যায়?

২য় সপ্তাহ

শিশুর টিকাকরণ–এর জন্য যা করণীয়

বুঝিয়ে বলুন

- শিশুর জন্মের পর সঙ্গে সঙ্গে টিকাকরণের জন্য, ASHA ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে।
- প্রতি মাসে একবার নিয়ম করে VHND বা 'গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস' পালন হয়ে থাকে। ঐ দিন নিকটবর্তী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মা, বাবা বা পরিবারের লোকেরা তাদের শিশুদের নিয়ে হাজির হবেন। ANM বা ASHA দিদি, অঙ্গনওয়াড়ি দিদি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সরাসরি মায়েদের পরামর্শ দেবেন, প্রশ্নের জবাব দেবেন এবং শিশুদের টিকাকরণের ব্যবস্থা করবেন।
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও সরকারি হাসপাতালে যে নির্দেশ দেওয়া হবে, তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।
- জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচী অনুযায়ী টিকা দিতে হবে।
- প্রত্যেকবার টিকাকরণ–এর পর শিশুকে ৩০ মিনিট টিকাকরণ কেন্দ্রে অবশ্যই থাকতে হবে।
- 'মা ও শিশু সুরক্ষা কার্ড'–এ টিকাকরণের রেকর্ড রাখতে হবে। প্রত্যেকবার কার্ডটিকে অবশ্যই সঙ্গে করে আনতে হবে।

পরে প্রশ্ন করুন

১) শিশুর টিকাকরণ–এর জন্য কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে?

২) 'মা ও শিশুর সুরক্ষা' কার্ড–এর গুরুত্ব কী?

৩) VHND বা 'গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস'–এ মায়েদের কেন যাওয়া জরুরি?

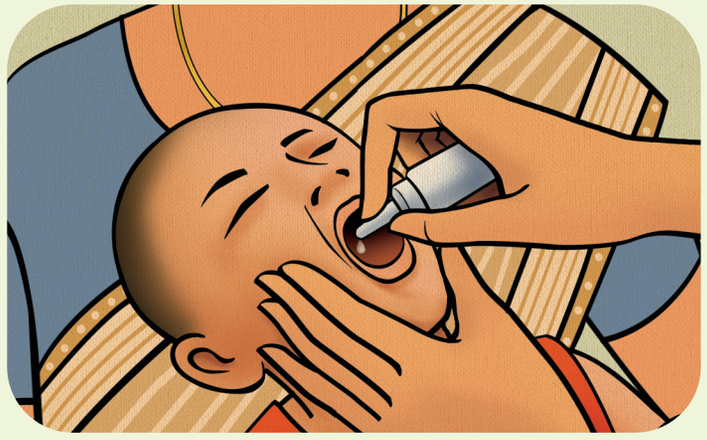

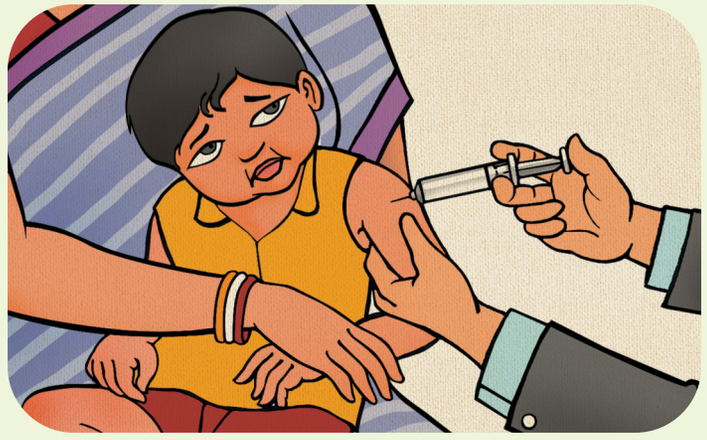

৩য় সপ্তাহ

টিকাকরণ কর্মসূচী

বুঝিয়ে বলুন

এক বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য	হেপ বি	বিসিজি	ওপিভি	পেন্টাভ্যালেন্ট	রোটাভাইরাস	পিসিভি	আইপিভি	হাম/ এম.আর.	জে ই	ভিটামিন-এ	পিসিভি বুস্টার
জন্ম	জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে		ওপিভি-০								
১½ মাস			ওপিভি-১	পেন্টা-১	রোটা-১	পিসিভি-১	আইপিভি-১				
২½ মাস			ওপিভি-২	পেন্টা-২	রোটা-২						
৩½ মাস			ওপিভি-৩	পেন্টা-৩	রোটা-৩	পিসিভি-২	আইপিভি-২				
৯ মাস								এম.আর.-১	জে ই-১	ভিটামিন-এ - ১	পিসিভি বুস্টার

এক বছরের বেশি বয়সী শিশুদের জন্য	ডিপিটি বুস্টার	ওপিভি বুস্টার	হাম/এম.আর.	জে ই	টিটি/টিডি	ভিটামিন-এ
১৬-২৪ মাস	ডিপিটি বুস্টার-১	ওপিভি বুস্টার	এম. আর.-২	জে ই-২		ভিটামিন-এ - ২
৫-৬ বছর	ডিপিটি বুস্টার-২					
১০ বছর					টিটি/টিডি	
১৬ বছর					টিটি/টিডি	

শিশুর বয়স	২ বছর	২.৫ বছর	৩ বছর	৩.৫ বছর	৪ বছর	৪.৫ বছর	৫ বছর
ভিটামিন-এ ৩-৯ ডোজ	ভিটামিন-এ - ৩	ভিটামিন-এ - ৪	ভিটামিন-এ - ৫	ভিটামিন-এ - ৬	ভিটামিন-এ - ৭	ভিটামিন-এ - ৮	ভিটামিন-এ - ৯

- গর্ভবতী মহিলাকে টিটি/টিডি ১ এবং টিটি/টিডি ২ এক মাসের ব্যবধানে নিতে হবে, এবং পূর্ববর্তী গর্ভাবস্থা যদি বিগত তিন বছরের মধ্যে হয়ে থাকে এবং সেই সময়ে তিনি টিটি/টিডি পেয়ে থাকেন তাহলে তাকে ১টি টিটি/টিডি বুস্টার নিতে হবে।
- ভিটামিন-এ প্রথম ডোজ ৯ মাসে নিতে হবে এবং এরপর ৬ মাস অন্তর ৫ বছর অবধি মোট ৯টি ডোজ নিতে হবে।

পরে প্রশ্ন করুন

১) শিশুর প্রথম এক বছরে কতবার টিকা দেওয়ার জন্য নিয়ে যেতে হবে?

২) শিশুর দু' বছর বয়সে কতবার টিকা পাওয়া দরকার?

৪র্থ সপ্তাহ

টিকাকরণ সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা এবং আসল সত্য

বুঝিয়ে বলুন

ভুল ধারণা – টিকাকরণের প্রয়োজন নেই, স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতাই অসুখ–বিসুখ দূরে রাখে।

যা সত্যি – টিকাকরণ বন্ধ করে দিলে রোগ আবার ফিরে আসে। তাই টিকাকরণ খুবই জরুরি।

ভুল ধারণা – টিকাকরণ করলে শরীরের ক্ষতি হয়, এর দীর্ঘমেয়াদি পার্শ্ব–প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি, মৃত্যুও হতে পারে।

যা সত্যি – টিকাকরণ খুবই নিরাপদ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে টিকার পার্শ্ব–প্রতিক্রিয়া হতে পারে, যেমন হাতে কালশিটে হওয়া, সামান্য জ্বর হওয়া ইত্যাদি। এই পার্শ্ব–প্রতিক্রিয়া সামান্য এবং ক্ষণস্থায়ী, যেমন – জ্বর।

ভুল ধারণা – শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ালে টিকাকরণ–এর প্রয়োজন হয় না।

যা সত্যি – বুকের দুধ খাওয়ালেও শিশুকে টিকা দিতেই হবে।

ভুল ধারণা – সাধারণ সর্দি–কাশি বা জ্বর হলে শিশুকে টিকা দেওয়া যাবে না।

যা সত্যি – সাধারণ সর্দি–কাশি, হাল্কা জ্বর বা অল্প ডায়রিয়া হলেও শিশুকে টিকা দেওয়া নিরাপদ।

ভুল ধারণা – একই সময়ে একাধিক টিকা নিলে শিশুর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

যা সত্যি – একই সময়ে একাধিক টিকা নিলে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর কোনও ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না।

পরে প্রশ্ন করুন

১) টিকাকরণের ফলে শিশু কী কী রোগের হাত থেকে বাঁচতে পারে?

২) টিকাকরণ বন্ধ করে দিলে কী হতে পারে?

প্রতিষেধক টীকাকরণ - কি ও কেন

টীকাকরণ কেন প্রয়োজন?

- প্রচলিত টীকাকরণ শৈশবকালে কয়েকটি প্রাণঘাতী রোগের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করে। এটি একটি নিরাপদ ও কার্যকরী রোগ প্রতিরোধক পদ্ধতি।
- জন্মের পর থেকে এক বছরের মধ্যে শিশুদের সম্পূর্ণ টীকাকরণ করা হলে ভবিষ্যতে শিশু নীরোগ ও সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে, এতে অর্থ ও সময় দুইই বাঁচে ও অনেক অমূল্য প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব।
- রোগমুক্ত শিশু স্বাভাবিক ভাবেই স্বাস্থ্যবান ও পরবর্তী জীবনে কর্মঠ, শক্তিশালী ও অধিক উপার্জনক্ষম হয়।

কিন্তু তাসত্ত্বেও দেখা গেছে জন্মের এক বছরের মধ্যে শিশুর যে সকল টীকা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা থেকে এক বিরাট সংখ্যক শিশু বঞ্চিত থাকে। নিম্নহারে শিশুর টিকাকরণের মূল কারণ হল -

- পূর্বনির্ধরিত ঘোষণা অনুযায়ী দূরবর্তী স্থানে, সাব-সেন্টারে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিষেধক টীকা না দিতে পারা
- শিশুদের বাবা-মায়ের টীকাকরণের বিষয়ে অজ্ঞতা ও টীকা নিতে আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতা
- দূরবর্তী স্থানে হওয়ার জন্য টীকাকরণ কেন্দ্রে পৌঁছতে না পারা
- পরিবারের কিছু কুসংস্কার
- শিশুকে টীকাকরণের জন্য নথিভূক্ত করতে ভুলে যাওয়া ও শিশুর পরিবারকে খবর না দেওয়া।

অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী হিসেবে নজর রাখবেন:

- আপনার এলাকায় যে সমস্ত গর্ভবতী মহিলা ও শিশুর টীকাকরণ দেওয়া দরকার, তার সম্পূর্ণ তালিকা সবসময় হাতের কাছে রাখুন ও নিয়মিত ঐ তালিকা আপডেট করুন।

- টীকাকরণের নির্ধারিত দিনে কোন কারনে টীকাকরণ না হলে সেই সংবাদ যেন আগে থেকেই পরিবারের কাছে পৌঁছে যায়। দূরবর্তী এলাকায় বিশেষ কোন প্রতিষেধক শিবিরের আয়োজন করা হলে, এই বিষয়টি ভালভাবে নজরে রাখবেন। বিশেষ করে দূরবর্তী এলাকা থেকে আসা কোন পরিবার যেন শিশুকে নিয়ে না ফিরে যায়, সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিন।

- কোন পরিবারের মধ্যে টীকাকরণ নিয়ে কুসংস্কার বা বিরোধ বা উদাসীনতা থাকলে সেই বাড়ী বারবার পরিদর্শন করুন। প্রয়োজন হলে উচ্চপর্যায়ের আধিকারিক ও এলাকার প্রভাবশালী মানুষদের আপনার সাথে যেতে অনুরোধ করুন।

- যে শিশুর বাবা-মা দুজনেই কাজে বের হয়ে যান, সেই পরিবারের শিশুকে আনার দায়িত্ব আশেপাশের কোন বাড়ীর মা বা অন্য কেউ, যিনি নিজের পরিবারের শিশুকে নিয়ে আসবেন, তাকে নিতে অনুরোধ করুন।
- এতদসত্ত্বেও কোন শিশু নির্দিষ্ট দিনে প্রতিষেধক টীকা নেওয়ার ব্যাপারে বাদ পড়ে গেলে, পরের সপ্তাহে যেন অবশ্যই তাকে টীকাকরণ করা হয়, সেদিকে ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখুন।

টীকাকরনের মাধ্যমে যে রোগগুলি থেকে শিশুকে রক্ষা করা যায় সেগুলি হল:

(১) যক্ষ্মা

যক্ষ্মা একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ। এর ফলে শিশু গুরুতরভাবে অসুস্থ ও কখনও কখনও মারাও যেতে পারে।

(ক) কিভাবে ছড়ায় -আক্রান্ত ব্যক্তি/শিশুর হাঁচি, কাশি, কফ ও থুতুর মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। এটি অত্যন্ত ছোঁয়াছে রোগ। রোগাক্রান্ত পশুর দুধ না ফুটিয়ে খেলেও এই রোগ হতে পারে।

(খ) লক্ষণ - দুসপ্তাহ বা বেশী সময় ধরে জ্বর ও/বা সাথে কাশি। এই সময় শিশুর ওজন কমে যায় বা ওজন বৃদ্ধি হয় না

(গ) কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় - বি.সি.জি. ইঞ্জেকশানের মাধ্যমে শিশুদের এই রোগ থেকে রক্ষা করা যায়।

(২) পোলিও

পোলিও একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ যা শিশুদের স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে। এর ফলে শিশুর পক্ষাঘাত এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। নিয়মিত টীকাকরণের ফলে এই রোগের সংক্রমন অনেকটাই কমানো গেছে।

(ক) কিভাবে ছড়ায় - অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, আক্রান্ত ব্যক্তির মল থেকে খাবারে সংক্রমণের মাধ্যমে বা পোলিও ভাইরাসে সংক্রামিত কোন জল, দুধ বা খাবার থেকে এই রোগ ছড়ায়। ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে ৩ বছরের আগেই এই রোগের সংক্রমণ ঘটে।

(খ) লক্ষণ - ১৫ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে হঠাৎ করে শরীরের কোন অঙ্গ দুর্বল বা অবশ হয়ে যাওয়া, বা বয়স্ক লোকেদের ক্ষেত্রে কোন অঙ্গ আচমকা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লে পোলিও হয়েছে বলে সন্দেহ করতে হবে।

(গ) কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় - নিয়মিত টীকাকরণের সময় ও.পি.ভি. টীকা নিয়ে ও পালস্ পোলিও টীকাকরণের সময় নিয়মিত টীকা নিয়ে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

(৩) ডিপথেরিয়া

ডিপথেরিয়া একটি ব্যাকটারিয়াজনিত রোগ যা সাধারণত শিশুদের টনসিল ও শ্বাসনালীতে সংক্রমণ ঘটায়। এর ফলে শিশুর শ্বাসকষ্ট হয়। কিছু ক্ষেত্রে শিশুর মৃত্যুও ঘটে।

(ক) কিভাবে ছড়ায় - আক্রান্ত ব্যক্তি/শিশুর হাঁচি, কাশি, কফ ও থুতুর মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।

(খ) লক্ষণ - আক্রান্ত শিশুর গলাব্যথা ও জ্বর হয়। মুখ হাঁ করিয়ে দেখলে গলার ভিতর সাদা ছোপও অনেক সময় দেখা যায়।

(গ) কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় - নিয়মিত টীকাকরণের সময় ডি.পি.টি. টীকাকরণের মাধ্যমে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

(৪) হুপিং কাশি

হুপিং কাশি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। এই রোগে শিশুর শ্বাসনালীতে সংক্রমণ হয়, যার ফলে শিশু ভীষণভষবে কাশতে থাকে। শ্বাসকষ্টের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুর মৃত্যুও ঘটে।

(ক) কিভাবে ছড়ায় - আক্রান্ত ব্যক্তি/শিশুর নাক ও মুখে এই ব্যাকটেরিয়া থাকে এবং হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।

(খ) লক্ষণ -দীর্ঘদিন ধরে বারবার কাশি, কাশির পর পরই বমি হওয়া এবং দুসপ্তাহ বা তার বেশীদিন ধরে তা চলতে থাকা এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। একটু বেশী বয়সের শিশুদের কাশির সাথে সাথে হাঁপানির মত সোঁ সোঁ করে আওয়াজ হয়।

(গ) কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় - নিয়মিত টীকাকরণের সময় ডি.পি.টি. টীকাকরণের মাধ্যমে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

(৫) টিটেনাস

টিটেনাস একটি ব্যাকটারিয়াজনিত রোগ যা সাধারণত শিশুদের সাথে যে কোন বয়সী মানুষেরই হতে পারে।

(ক) কিভাবে ছড়ায় - টিটেনাস রক্তের সংক্রমণের মাধ্যমে ছড়ায়। টিটেনাসের জীবানু লেগে থাকা কোন বস্তু, যেমন অপরিচ্ছন্ন ব্লেড, কাঁচি বা ছুরি, যা ঠিকভাবে জীবানুমুক্ত করা হয়নি, সেগুলো শরীরের কাটা-ছেঁড়ায় ব্যবহার করলে টিটেনাস সংক্রমণ হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জন্ম হলে নবজাতকদের ক্ষেত্রে জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই এই রোগের সংক্রমণ দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রোগে শিশুর মৃত্যু হয়।

(খ) লক্ষণ - নবজাতকদের ক্ষেত্রে জন্মের তিন থেকে আঠাশ দিনের মধ্যে মায়ের দুধ টানতে না পারা, ঘাড় ও শরীর শক্ত হয়ে যাওয়া, সময়ে সময়ে পেশীর খিঁচুনী এই রোগের সাধারণ লক্ষণ।

(গ) কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় - গর্ভাবস্থায় মাকে দুবার টিটেনাসের ইঞ্জেকশান দেওয়া ও জন্মের পর সূচী মেনে টীকাকরণের মাধ্যমে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

(৬) হেপাটাইটিস বি

হেপাটাইটিস বি একটি ভাইরাসঘটিত রোগ। এটি একটি অত্যন্ত ছোঁয়াছে রোগ। এই রোগ থেকে লিভারের সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সারের মত ভয়াবহ রোগও হতে পারে।

(ক) কিভাবে ছড়ায় -রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বা দেহতরলের মাধ্যমে এক রোগ ছড়ায়। ইঞ্জেকশনের ছুঁচ জীবানুমুক্ত না করা হলে বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দাঁতমাজার ব্রাশ বা দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম থেকেও এই রোগের সংক্রমণ হতে পারে।

(খ) লক্ষণ - জ্বর, মাথাধরা, বমি-বমি ভাব, বমি হওয়া, চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া - এগুলো এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। তবে কেবলমাত্র রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই এই রোগের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

(গ) কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় - হেপাটাইটিস বি টীকাকরণের মাধ্যমে এই রোগের সংক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

(৭) হাম

হাম ভাইরাসঘরিত একটি অত্যন্ত ছোঁয়াছে রোগ। হামে আক্রান্ত হলে শিশুর অন্যান্য রোগেরও, যেমন ডায়েরিয়া বা নিউমোনিয়া রোগের সংক্রমণ ঘটে ও এর ফলে শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

(ক) কিভাবে ছড়ায় - এটি একটি বায়ুবাহিত রোগ। এই রোগের জীবানু রোগাক্রান্ত শিশুর নাক, মুখ ও গলায় থাকে এবং হাঁচি/কাশির মাধ্যমে ছড়ায়।

(খ) লক্ষণ - বেশ কিছুদিন ধরে জ্বর, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া, গায়ে ও মুখে লাল ছোপ হওয়া, চোখ লাল হয়ে যাওয়া এই রোগের সাধারণ লক্ষণ।

(গ) কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় -টীকাকরণের সময়ে দেওয়া হামের প্রতিরোধক ইঞ্জেকশানের মাধ্যমে এই রোগের সংক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

(৮) জাপানীজ এনসেফেলাইটিস

জাপানীজ এনসেফেলাইটিস একটি ভাইরাসঘটিত রোগ। ভারতে যত ধরণের ভাইরাসঘটিতএনসেফেলাইটিস দেখা যায়, তার মধ্যে জাপানীজ এনসেফেলাইটিস সবথেকে মারাত্মক ধরণের। পশ্চিমবঙ্গের মালদা, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় এই টীকাকরণ কর্মসূচী চালু আছে।

(ক) কিভাবে ছড়ায় -জাপানীজ এনসেফেলাইটিস একটি মশাবাহিত রোগ। সাধারনত পাখী ও গৃহপালিত জন্তু, বিশেষ করে শুয়োর এই রোগে আক্রান্ত হয়। ঐ রোগে আক্রান্ত কোন প্রাণীকে কামড়ানোর পর মশা কোন সুস্থ মানুষকে কামড়ালে তার এই রোগে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

(খ) লক্ষণ -জ্বর, সাথে মানসিক স্থিতি নষ্ট হওয়া, প্রলাপ বকা এই রোগের লক্ষণ। রোগী প্রায়শই কোমায় চলে যায়।

(গ) কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় - টীকাকরণের মাধ্যমে এই রোগের সংক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।